বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

‘পদ্দা’ সেতু থেকে শিক্ষণীয় কিছু বিষয়

ড. সাজ্জাদ জহির

দৈনিক বণিক বার্তা
জুলাই ০৩, ২০২২

দীর্ঘদিনের জানা বাংলাদেশ ও সেতু উদ্বোধন-প্রাক্কালের দুদিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনে অর্জন-সম্ভাবনার অনুল্লেখিত কয়েকটি দিক প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই এ নিবন্ধ। জটিল হতে থাকা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিবিধ চুক্তির মাঝে অঘোষিত যোগসূত্র থাকাটা স্বাভাবিক। সে কারণে প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাপ্তি হ্রাস পায় এবং যারা চালকের ভূমিকায় আছেন, তাদের পক্ষেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তবে যুক্তি কাঠামোভিত্তিক অনুসন্ধান সেই বিশ্লেষণকে পূর্ণতা পেতে সহায়তা করবে, যদি তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা থাকে।

বিশ্বব্যাংকের মিথ্যা দুর্নীতির অপবাদ, বিশিষ্ট নাগরিকদের সংশয়, অনেকের বক্রোক্তি এবং কোনো এক ব্যক্তির নিজ স্বার্থে বিরোধিতা—এ জাতীয় বিবিধ বাধার বর্ণনা এবং সেসব পেরিয়ে অর্জনের কাহিনী, প্রধানমন্ত্রী দুদিনের ভাষণেই উল্লেখ করেছেন। কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও এবং তথ্যের অভাবে গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও, এটা অনস্বীকার্য চলার পথ মসৃণ ছিল না। নিঃসন্দেহে নেতৃত্ব দৃঢ়চিত্তের হওয়ায় সেতু নির্মাণের কার্যকর সমাপ্তি ঘটেছে। তবে নির্মাণ-পরবর্তী অতিজরুরি প্রায়োগিক অনেক বিষয়ের প্রতি নজর না দিলে এবং অর্জনের নির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করে তা সংহত না করলে এ অর্জন ম্লান হয়ে যেতে পারে। সম্ভাব্য সে জাতীয় অবক্ষয় প্রতিহত করার জন্য আইনি পথের চেয়ে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার প্রসার সমাজে স্থিতি এবং অধিক অগ্রগতি আনতে সহায়ক হবে।

বিগত বছরগুলোয় পদ্মা সেতুর আলোচনায় প্রকল্পের বর্ণনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক জাতীয় ‘বহুজাতিক’ ঋণ সংস্থা এবং অন্যান্য ‘দ্বিপাক্ষিক’ ঋণদানকারী সরকারের (বা সংস্থা) ভূমিকা এবং সর্বোপরি উন্নয়নশীল দেশের সরকার ও নাগরিক সমাজে অনেকের মাঝে ঔপনিবেশিক আনুগত্যশীল মনোভাব ও কার্যকলাপের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের নানাবিধ দিক আলোচিত হয়েছে। এসব জটিল সমীকরণে স্বাধীনভাবে দেশীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা শুনলে মনে আশা জাগে। আগামীতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হবে এবং নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে, সে ভরসায় এ নিবন্ধটিতে কিছু প্রস্তাব রাখছি।

প্রকল্প, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন

অনেকেই স্বীকার করেন, উপনিবেশ বিলুপ্ত হলেও ঔপনিবেশিকতার বিলুপ্তি ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হয় জাতিসংঘের বিভিন্ন খাতওয়ারি শাখা-প্রশাখা সুসংহত করার বাইরে ‘ব্রেটন উড’ প্রতিষ্ঠান নামধারী ‘বিশ্বব্যাংক’ (আইবিআরডি), আন্তর্জাতিক মুদ্রা

তহবিল (আইএমএফ) এবং আইটিও (যা বহুদিন নিষ্ক্রিয় থেকে ১৯৯০-তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামে পরিচিতি পায়) মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একই সময়ে বেশ কয়েকটি ক্ষমতাশীল দেশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোয় নিজেদের আর্থিক ও কৌশলগত স্বার্থ এগিয়ে নিতে নিজস্ব দ্বিপক্ষীয় সংস্থার ওপর ভর করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্বিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান ছিল ইউএসএইড। ইউরোপের মাটিতে মার্শাল প্ল্যানের 'সফলতা'র পর প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা, ঋণ সংস্থা কর্তৃক তার অনুমোদন ও অর্থায়নকালে প্রকল্প তদারকির রীতি চালু হয়। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুতে সোনার বাঁধন (গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড) থেকে বেরিয়ে এসে মার্কিন ডলারের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি একদিকে যেমন উন্নয়নে গতিবেগ আনে, তেমনি বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এসব মধ্যস্বত্বধারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সেই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল।

'এইড' বা 'দাতা-সংস্থা' (ডোনার) জাতীয় নামোল্লেখ আমাদের ভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তপথে চালিত করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঋণ ও অনুদানের অধিকাংশ আসে ঋণ হিসেবে। এমনকি অনুদানের (গ্রান্ট) অংশটিও ঋণ প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন, বাস্তবায়নে তদারক এবং পর্যবেক্ষণে ব্যয় হয়। আমাদের মাঝে যে হীনমন্যতাবোধের ঈঙ্গিত সেদিনের ভাষণে ছিল, তা লালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান ঋণ প্রকল্পে না থাকলে অনুদানের অর্থে মেটানো সম্ভব হয়। বিশালাকার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে উঠলেও আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘাটতি মেটাতে অর্থ ও বহিঃসম্পদ বিভাগ (যা বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নামে পরিচিত) ঋণপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করতে সদাআগ্রহী থাকে। একই সঙ্গে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি মেটানোর জন্য ঋণ নেয়াকে যৌক্তিকতা দেয়া হয়। অথচ বৈদেশিক ঋণ নেয়া এমন অনেক প্রকল্প আছে, যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার কোনো প্রয়োজন নেই! সাধারণভাবে ঋণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক ধাপ পেরোতে হয়, যেমন 'প্রকল্প' প্রণয়ন করতে হবে, তার একটি নির্দিষ্ট আবাস (অর্থাৎ, খাতভিত্তিক কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) স্থির করতে হবে এবং ঋণ ব্যবস্থাপক সংস্থার পক্ষে কয়েকজন পরামর্শক নিয়োগ দিতে হবে। এ জাতীয় চুক্তিতে কোনো এক পক্ষের একক সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকা কাঙ্ক্ষিত নয়। অথচ সেতু নির্মাণের যাত্রা-কাহিনী থেকে আমরা জেনেছি যে তেমনটিই হয়েছিল, এবং চুক্তির শর্তাবলির কারণে অনেক ক্ষেত্রে অযাচিত হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমানের অর্জনকে স্থায়িত্ব দিতে চাইলে সব বৈদেশিক ঋণচুক্তির পর্যালোচনা হওয়া জরুরি। আমার জানা মতে, সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (যা বহিঃসম্পদ বিভাগ নামে পরিচিত ছিল) বিবিধ চুক্তি সম্পাদনে সংযোগস্থলের কাজ করে। ক্ষেত্র-নির্বিশেষে সব চুক্তিতে কিছু শর্ত থাকা (বা কিছু শর্ত বাদ দেয়া) প্রয়োজন, যা চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে আমাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখবে। উপরন্তু ঋণ পরিশোধের দায় যদি এ দেশের নাগরিকদের থাকে, তবে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের মুখ্য ভূমিকা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রয়োজনে আমাদের হয়ে যারা ঋণপত্রের শর্ত মেনে সই করছেন, তাদেরকেও আইনিভাবে দায়বদ্ধতায় আনতে হবে। দরকষাকষিতে হীনম্মন্যতা ত্যাগের আহ্বানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তাই সাধুবাদ জানাই। যেকোনো প্রকল্প নির্বাচনে একাধিক পক্ষের ভিন্ন অবস্থান ও ভিন্নমতাবলম্বীর সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রকল্প নির্বাচনে নানা স্বার্থের ভারসাম্য ও সংবেদনশীলতা

বিশ্বায়নের এ পর্বে সংযুক্তি সর্বাগ্রে রয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন ত্বরান্বিত করা যার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ভূখণ্ডে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পাঁচ যুগের অধিক সময় লেগেছে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) গ্রামীণ রাস্তা তৈরি নিয়ে অনেক গল্পই রয়েছে। আমরা শুনেছি, প্রায়ই রাস্তাগুলো চেয়ারম্যানের বাড়ি সংস্পর্শ করে যেত, প্রকল্প প্রণয়নে এ বাস্তবতা অনস্বীকার্য ছিল। তবে আরো বড় সত্য, একবার রাস্তাঘাট তৈরি হলে তা কাছের এবং দূরের জমির মালিকের আপেক্ষিক লাভ-ক্ষতিতে স্থায়ী প্রভাব ফেলত। অর্থাৎ রাস্তা বা বাজারসংলগ্ন এলাকায় জমির দাম অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেত এবং সেখানকার কৃষক অধিকতর কম খরচে এবং স্বল্প সময়ে উৎপাদনের উপকরণ পেতে এবং পণ্য বাজারজাত করতে সক্ষম হতো। সত্তর-আশির দশকে একই ঘটনার ব্যাপ্তি ঘটে দেশীয় পটে (সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধানে) এবং কিছু অঞ্চলে (বিভাগ পর্যায়ে এলজিইডির কর্মে)। এসব ক্ষেত্রে প্রকল্প নির্বাচন অনেক সময় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির হারের (রেইট অব রিটার্ন) ওপর নির্ভর করত, যা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আঞ্চলিক বৈষম্যকে বৃদ্ধি করত। এছাড়া কথিত আছে, প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক নিবাস ও তাদের অবসরকালীন রাজনীতিতে ভোটপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রকল্প নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। সেই ষাটের দশক থেকেই অস্তিত্বহীন মাটি কাটা বা ভরাটের খরচ দেখিয়ে অর্থ লোপাটের গল্প কম-বেশি আজও আছে বলে অনুমেয়।

বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষত এ উপমহাদেশে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংযুক্তির জন্য যাতায়াত ব্যবস্থায় বিনিয়োগ নব্বইয়ের দশক থেকে গুরুত্ব পেতে শুরু করে, যদিও গত দেড় দশকে তার রূপরেখা পূর্ণতা পায়। আমি যমুনার ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণকে তার শুরু হিসেবে দেখি না, বরং ১৯৯৭-৯৮-এর দিকে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের ভূমি অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে গ্যাস-পাইপলাইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সেভাবে দেখা যায়, যা নানা কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, বঙ্গবন্ধু সেতু ছিল দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য রোধের প্রথম বিশালাকারের উদ্যোগ, যার

সঙ্গে পরবর্তীকালে আঞ্চলিক স্বার্থ ও সংযুক্তির যোগসূত্রতা তৈরি হয়েছে। শুরুতে বিশ্বব্যাংকের বাধা ছিল বলে জেনেছি, যার বিপক্ষে তদানীন্তন সরকারি প্রশাসনের তিনজন কর্মকর্তা (যাদের সবাই অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন) তথ্যনির্ভর যুক্তি দিয়ে সরকার-পক্ষের পেশাগত অবস্থানকে জোরদার করেছিলেন। তথ্যনির্ভর গবেষণা থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে (যমুনা) সেতুর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংকের ২০০৮ সালের প্রকাশনায় দেশটির পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনকে প্রকৃতি-সৃষ্ট গণ্য করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে করণীয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। অথচ যমুনার পশ্চিম পাড়ের পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিলে, দক্ষিণের সংযুক্তির বিনিয়োগ-ভাবনা ভিন্ন হতে পারত।

সবারই হয়তো মনে আছে, ওই সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম 'করিডরের' (বা লিংক রাস্তা ও রেল চলাচল) প্রতি বিভিন্ন বিদেশী ঋণ সংস্থা অধিক গুরুত্ব দিত। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হলো, আঞ্চলিক ও বহির্বিশ্বের নানা স্বার্থের সম্ভাব্য সম্মিলন তখনো বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে মূল আঞ্চলিক সংযুক্তির বাইরে গণ্য করত। ২০১৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'কানেক্টিং সাউথ এশিয়া অ্যান্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম সমুদ্র (এবং গভীর সমুদ্র) বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে। আরো উল্লেখ্য, সে সময়ে মিয়ানমারকে নিয়ে বহির্বিশ্বে আশার সঞ্চার হয়েছিল এবং একই সঙ্গে ১৯৯১ সালে প্রসূত কালাদান প্রকল্প শেষ হওয়ার আশা জেগেছিল। সেটা হলে ভারতের মিজোরাম ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য থেকে, অতি অল্প খরচে (সড়ক ও জলপথে মিয়ানমারের সিতওয়ে হয়ে), সম্পদ ও পণ্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে স্থানান্তর সম্ভব হতো। সে ধরনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রকল্প নির্বাচন ও সংযুক্তি অবকাঠামোয় বিনিয়োগ রীতিমতো জুয়া খেলা! সে খেলায় বিচক্ষণতা দেখিয়ে বাংলাদেশের নেতৃত্ব অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

লক্ষণীয় যে যমুনা পেরিয়ে উত্তরের সংযুক্তি মূলত উত্তর পথ দিয়ে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলকে অধিক উপকার দেবে। অথচ পদ্মা সেতুর মাধ্যমে সংযোগ বাংলাদেশের বিশাল দক্ষিণাঞ্চল ও (ভারতের) পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকে অনেক বেশি উপকৃত করবে। কয়েক বছর আগে পদ্মা সেতুকে ঘিরে টেলিভিশনের এক আলোচনায় (জনাব নূহ-উল-আলম-লেনিন ও প্রয়াত জনাব মাহফুজুল্লাহর উপস্থিতিতে) আমার অবস্থানের পক্ষে এ যুক্তিগুলো দিয়েছিলাম। সে আসরে এটাও ব্যক্ত হয়েছিল যে, আঞ্চলিক স্বার্থেই যমুনার ওপর নতুন রেল সেতু নির্মাণ অনিবার্য। ঘটনা এবং প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন অনেক দূর এগিয়েছে, আজ এটা স্পষ্ট, বিশ্ব ও আঞ্চলিক পর্যায়ের মহাপরিকল্পনার বাইরে আমাদের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডগুলোকে দেখলে একপেশে মনে হবে। এটাও অনস্বীকার্য যে, সে পরিকল্পনাতেও রদবদল আনা সম্ভব যদি উন্নয়নশীল দেশের মেধা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাইরের মহাপরিকল্পনা বুঝে নিজ দেশের স্বার্থের অনুকূলে প্রকল্প নির্বাচনে দরকষাকষি করে। হীনম্মন্যতা ত্যাগ করে এ স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে লক্ষ্য করা যায়।

এ দীর্ঘ পথচলায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অবস্থান নিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থানের ভিত্তিতে কারো দেশপ্রেম যাচাই করা অনুচিত বলে আমি মনে করি। বরং আজকের পৃথিবীতে বিচিত্র সংযোগের মেলবন্ধন যদি বাংলাদেশের মাটিতে হয়, তা এ দেশের মানুষের জন্য অধিক সমৃদ্ধি আনবে। এটা অনস্বীকার্য, বাইরের স্বার্থে প্রসূত বিভিন্ন পরিকল্পনা আমাদের মাঝ দিয়েই কার্যকর করা হয় এবং তথাকথিত 'সুশীল' সমাজ, বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন, ব্যবসায়ী-শিল্প মালিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের কোনোটিই এর থেকে বাদ পড়ে না। এ অবস্থায় বিভক্তি বাড়ালে অযোগ্য ও তোষামোদকারীদের অবস্থান প্রশস্ত করা হবে। আমার আশা থাকবে যেন বিচিত্র মেধাকে ধারণ করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে আজকের নেতৃত্ব আরো কঠিন ও প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য সমাজকে তৈরি করে আবারো নতুন দৃষ্টান্ত রাখবে।

পরিশেষ ১: ভাষার অস্তিত্ব

এ নিবন্ধে পদ্মার বানান নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে। বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে, যে আলোচনায় ভাষাবিদদের অংশ নিতে হবে। তবে আমার জানা মতে, লাতিনের সহোদর হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে গণ্য করে হিন্দিকে তার উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মতবাদ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই চলে আসছে। সেই মতে, সরলরৈখিকভাবে বাংলাকেও সংস্কৃতের উত্তরসূরি হিসেবে দেখানোর জোরালো প্রচেষ্টা রয়েছে, যার সত্যতা সম্পর্কে নিকট-অতীতকালে অনেক গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, সংস্কৃতের আগ্রাসন উপমহাদেশের পশ্চিমে যেভাবে ঘটেছে, তা পূর্বে বা দক্ষিণে ঘটেনি। কেউ কেউ মনে করেন, স্থানীয় দ্রাবিড়, কোল ও অহম ভাষা স্পষ্টতই বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। এমনকি দু-একজন আছেন যারা 'আদি বাংলা' ভাষার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। [এ ব্যাপারে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর রচনা দ্রষ্টব্য।] যদি ভাষার স্বকীয়তা একটি জাতির স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হয়, তাহলে যুগের (জ্ঞান-বিকাশ) সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার যেমন উৎকৃষ্ট সাধন প্রয়োজন, তেমনি চলতি প্রকাশের ধরনে অপ্রয়োজনীয় বহিঃসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা জরুরি। প্রযুক্তির ওপর ভর করে সংখ্যায় রূপান্তরিত তথ্যপ্রবাহের (ডিজিটাল) যুগে ভাষার অঙ্গনেও স্থান দখলের প্রতিযোগিতা চলমান। এর বিপজ্জনক দিক হলো, প্রযুক্তিবান্ধব করতে গিয়ে ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি ঘটে। স্বাধীন জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পুনঃঅঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে, তার এক ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে সম্ভবত এখনই সময় পদ্মার বানানকে স্বীকৃতি

দেয়া। সবাই স্বীকার করবেন যে পদ্-মা (পদ্মা) উচ্চারণ আমরা করি না। আমরা পদ্-দা (পদ্দা) বলি। তাই আমাদের মধ্যকার বিদেশীতুষ্টের হীনম্মন্যতাবোধ দূর করার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে পদ্দার (পদ্মার) বানান সংশোধনের অনুরোধ করব।

পরিশেষ ২: কাঁটা তারের সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃতমান সংযুক্তির সার অনুধাবন

সংযুক্তির যেকোনো প্রকল্প তার উৎস (শুরু) ও গন্তব্যের (শেষ) বসতি ও শিল্প-বাণিজ্যের জন্য যেমন সুফল বয়ে আনে, খেয়াঘাটের মাঝি বা চায়ের দোকানদাররা জানেন যে, তাদের পাট গুটিয়ে অন্য কোথাও বা অন্য কোনো পেশায় জীবিকা খুঁজতে হবে। একইভাবে টোল রাস্তার দুই পাশের অনেকেরই সুন্দর রাস্তা দেখার সুযোগ থাকবে, কিন্তু তা ব্যবহারের সামর্থ্য থাকবে না। এমনকি দীর্ঘকালের প্রতিবেশী সেই রাস্তার কারণে এখন যোজন-যোজন দূরে। এসবই অনিবার্য পরিণতি, যা একটি দেশের জনসাধারণ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বরণ করে নেয়। কিন্তু সংযুক্তিতে যদি বাইরের স্বার্থ প্রাধান্য পায়, তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা ভেবে দেখা জরুরি। আমরা যেমন শহর থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার সংঘাত লাঘবে সচেষ্ট হই, তেমনি অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আগে থেকে ভাবা ও তার সম্ভাব্য সমাধান রাখা প্রয়োজন। সংঘাতের ক্ষেত্রে কার স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি তা একটি জাতীয় সরকারের জন্য বিভীষিকাময় হতে পারে এবং সে কারণে সংসদীয় বা সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকে আইনি রূপ দেয়া যেতে পারে।

পরিশেষ ৩: ঋণের ব্যবহার

ঋণের ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের মাত্রা বাড়ানো জরুরি। তবে ঋণ ব্যবহারে আমাদের চাওয়া নিশ্চিত করতে চাইলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অধিক সাশ্রীয় হওয়া এবং হিসেবে স্বচ্ছতা আনতে হবে। এ ব্যাপারে পাবলিক অডিটের আবেদন বহুদিনের।

পরিশেষ ৪: পদ্দা সেতুকে নিয়ে আগামীর কথা

সেতুপথ খুলে দেয়ার পর কিছু জটিলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা অনেকেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করতে উদগ্রীব। সেসব অভিব্যক্তি হীনম্মন্যতার বহিঃপ্রকাশ কিনা ভেবে দেখা উচিত। স্থানকাল নির্বিশেষে দেখা যায়, বিনিয়োগ প্রকল্পে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজে বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয় কিন্তু সেই অবকাঠামোকে সচল রাখার কার্যক্রম ও তা রক্ষণাবেক্ষণে সীমিত অর্থ বরাদ্দ থাকায় সেসব কর্মকাণ্ডে মনোযোগী হওয়ার প্রতি কর্তৃপক্ষের আকর্ষণ কম। তাই সেসবের জন্য আগাম পরিকল্পনায় ত্রুটি রয়ে যায়! কারণ না ঘেঁটে নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে পদ্দা সেতুতে যান চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে বর্তমানের ডিজিটাল যুগের উপযোগী প্রয়োগযোগ্য কিছু প্রস্তাব রাখব।

[এ নিবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।]

ড. সাজ্জাদ জহির: নির্বাহী পরিচালক
ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ